শামসুর রাহমানের আকাঙ্খা ছিল তাঁর স্বদেশে 'মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে না, মানুষের পরার কাপড় থাকবে, খাবারের নিশ্চয়তা থাকবে এবং ব্যক্তিত্ব ক্ষুণ্ণ হবে না।' কিন্তু এই আকাঙ্খা তাঁর নাগালের বাইরে থেকে গিয়েছিল জীবনের শেষ দিন অবধি। পাকিস্তানি আমলে তাঁর শহর ঢাকা এবং অবশিষ্ট গোটা পূর্ববঙ্গ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের অঘোষিত উপনিবেশ। এই উপনিবেশ থেকে মুক্তির জন্যে প্রায় তিরিশ লক্ষ বাঙালি শহিদ হয়েছিল, মেয়েরা ধর্ষিতা হয়েছিল, নয় অন্যভাবে লাঞ্ছিতা হয়েছিল। তারপরই সম্ভব হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ আদায়ের জন্যে যে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা তার আত্মপ্রকাশ ছিল উনিশ শ' বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলনের শুরু দিয়ে। সেটা গত শতকের পঞ্চাশের দশক। প্রকৃত প্রস্তাবে সামসুর রাহমান এই দশকেই শুরু করেছিল কবিতা - যাত্রা। যাত্রার প্রথম চরণে সদ্য মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান পাওয়ার আনন্দে একটা মাতোয়ারা মতো অবস্থা, সেইসঙ্গে প্রচ্ছন্ন কিছু সংশয়ের কাঁটাও। সেই দশকেই বাংলার বদলে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার উর্দি পরিয়ে বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেবার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল তখনকার পাকিস্তান সরকারের। এই রাজনৈতিক অন্ধতা সে দেশের বাঙালি কবিদের চিন্তা চেতনাকে অকস্মাৎ চূড়ান্ত এলোমেলো করে দিয়েছিল। কিছু কবি ভেবেছিল ইসলাম মানে দেশপ্রেম, দেশপ্রেম মানে ইসলাম। এই ধরনের এক ধারণা মেকি ঐক্যের ওকালতি করলেও সেটা ছিল হাতে গোনা দু-চার জনের বিষয়। সমস্ত বাঙালি ও পাকিস্তানের বাংলা ভাষার কবিরা আঁকড়ে থাকলেন আপন ভাষাকে। বাঙালির মনে এই প্রথম দেখা দিল অস্তিত্ব ও সত্তার অনিবার্যতা, আর তা বাংলাদেশের মুসলমান আমাদের সামনে হাজির করল। সুতরাং উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রশ্নটি বাতিল হল এই অনিবার্যতার সামনে। বাঙালির, পাকিস্তানে বসেই গর্জন করে উঠেছিল পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে, কবিরা ছিল তার পুরোভাগে এবং এই গর্জে ওঠার রাস্তায় তাঁরা আবিষ্কার করলেন শস্য - শ্যামলে পদ্মা মেঘনা খাল বিল ডহরে ঘেরা আপন আবহমানকালের স্বদেশ, যার কোনো বিকল্প হয় না। শামসুর রাহমানের কবিতায় এসব কথা কতবার কতভাবেই যে বলা হয়েছে!

...সোনালি অলস মৌমাছিদের
পাখার গুঞ্জনে জ্বলে ওঠে মন, হাজার হাজার বছরের ঢের
পুরোনো প্রেমের কবিতার রোদে পিঠ দিয়ে বসি, প্রগাঢ় মদের
চঞ্চলা সেই রসে - টুপটুপ নর্তকী তার নাচের নূপুর
বাজায় হৃদয়ে মদির শব্দে, ভরে ওঠে সুরে শূন্য দুপুর
এখনো যে এই আমার রাজ্যে - এটুকুই ছিল গাঢ় প্রার্থনা
ঈশ্বর! যদি নেকড়ের পাল দরজার কোনে ভীড় করে আসে
এইটুকু ছিল গাঢ় প্রার্থনা - তবুও কখনো ভুলব না, ভুলব না।
(রূপালি স্নান/ প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে)

'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থটিকে হয়তো এখানে মনে পড়ে যাবে। তাতে কিন্তু শামসুর রাহমানের আবেগ খর্ব হয় না। পাঠক জীবনানন্দের ছায়াকে পার হয়ে যাবেনই যখন শেষের পংক্তি দুটির বেদনায় প্রবেশ নেবেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কবি হুমায়ুন আজাদকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার থেকে শামসুর রাহমানের কথা, 'আমার গোড়ার দিকের কবিতা জীবনানন্দ দাশ প্রভাবিত করেছিল।' এরপর তাঁর কবিতা ও জীবনানন্দ দাসের প্রভাব নিয়ে কথা বলার আর কোন অবকাশ থাকে না বরং আমরা অভিভূত হই বাংলার নিসর্গ ও জীবনের মায়ায় আচ্ছন্ন একজন মুক্তিকামী কবিকে দেখে। সেইসঙ্গে আমরা যারা ঢের কম ভারতীয় বাঙালি, নিজেদের দিকে তাকিয়ে একটু বিষণ্ণও হব। হয়তো কখনো কখনো লক্ষ্যেও আসবে বাংলাদেশের পঞ্চাশের কবিদের সঙ্গে আমাদের পঞ্চাশের কবিদের কী অসম্ভব ফারাক! একই বাঙালি কবি, বাংলাভাষায় কবিতা রচনা করেন, অথচ তাঁরা ব্যস্ত বাঙালির আপন সত্তার প্রশ্নে আর আমাদের কবিরা গিনসবার্গের কবিকৃতিতে আপ্লুত। বাংলাদেশের কবিতা অভিভাবকত্ব পেয়েছে সামসুর রাহমানের যিনি নিজের কবিতায় খুঁটে খুঁটে তুলে নিয়েছিলেন জীবনের চলাচল, বাঙালির অস্তিত্বের সংকট ঃ

আমাদের বারান্দায় ঘরের চৌকাঠে
কড়িকাঠে চেয়ারে টেবিলে আর খাটে
দুঃখ তার লেখে নাম। ছাদের কার্নিশ, খড়খড়ি
প্রেমের বার্নিশ আর মেঝের ধুলোয়
দুঃখ তার আঁকে চকখড়ি
এবং বুলোয়
তুলি বাঁশি - বাজা আমাদের এই নাটে।
(দুঃখ/ রৌদ্র করোটিতে)

তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে এই দুঃখের শেকড় হলেও এটা কোনো সাধারণ দুঃখ নয়, মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার দুঃখ যা কিনা যন্ত্রণাময়তায় আকীর্ণ। শামসুর রাহমান তাই তীব্র শ্লেষও নিয়েছেন তাঁর কবিতায় ঃ

প্রভু, শোনো, এই অধমকে যদি ধরাধামে পাঠালেই
তবে কেন হায় করলে না তুমি তোতাপাখি আমাকেই
মিলতো সুযোগ বন্ধ খাঁচায় বাঁধা বুলি কুড়োবার
বইতে হত না নিজস্ব ভাষায় বলবার গুরুভার।
(প্রভুকে / রৌদ্র করোটিতে)

এই উদাহরণগুলি যদিও একটা সীমাবদ্ধ সময়ের রক্তপাত ও বোধ থেকে উৎসারিত কিন্তু পার হয়েছে সেই সময়কে। অর্থাৎ শামসুর রাহমানের কবিতা সীমাবদ্ধ সময়েও সত্য আবার চিরকালীনতায়ও সত্য। এইখানেই শামসুর রাহমান হয়ে ওঠেন হাল সময়ের কবি।

কবিতা স্লোগান নয়, নান্দনিক সৃষ্টি। কিন্তু স্লোগান ও নান্দনিক সৃষ্টিশীলতার বিষয় একই হতে কোনো বাধা নেই। তবে স্লোগানের বিষয় নগ্ন তীক্ষ্ণ ও তাৎক্ষণিক। কবিতায় তা গভীর সংগোপন ও রহস্যময়। স্লোগান মুহূর্তকে প্রজ্বলিত করে কবিতা কাজ করে অনন্তসময়েও। শামসুরের কবিতা এই অনন্তে পৌঁছতে অনেক বাঁক পার হয়েছে, বহু কারুকাজ গ্রহণ ও বর্জন করেছে। এইসব কথার সমর্থনে মাত্র দুয়েকটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছিঃ

১। এখন আমি একটা কিছু ভেঙে যেতে দেখলে বিষম
ভেঙে পড়ি
গোলাপফুলের চারাটি তার সজীবতা
খোয়ালে খুব ভয় পেয়ে যাই-
বালকবেলার দুপুরে কাটা ঘুড়ির দৃশ্য আবার
যখন তখন মনে পড়ে।
(এখন আমি/ এক ধরনের অহংকার)

২। চড়ুই নীড় বেঁধে এখানে এই ঘরে
রাখতে চায় তার প্রেমের সাক্ষর
অথচ জানে না সে বিপুল চরাচরে

প্রকৃত প্রস্তাবে আমারই নেই ঘর।

(প্রকৃত প্রস্তাবে/ উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ)

৩। কতবার ভোটকেন্দ্র ছেড়ে আমি
এসেছি নিজের খুব কাছে ফিরে, পা ফেলে আপন
হৃদয়ের একলা চত্বরে
নতুন প্যাকেট থেকে তাজা সিগারেট বার করে
খানিক ভেবেছি আরো কথা, ধোঁয়া ছেড়ে
ভেবেছি সমুদ্রে হোমারের আর যেহেতু ইউলিসিস নয়
এসেছি আবার ফিরে জীর্ণ ঘরে মশার গুঞ্জনে।

(ভোট দেব/ বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে).

শামসুর রাহমানের কবিতার বই সংখ্যায় বেশ বেশি। অনর্গল তিনি লিখেছেন লেখা শুরুর দিন থেকে। দিনে দিনে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। সে জনপ্রিয়তার সীমা ভাবাই যায় না এদেশে বসে। বাংলাদেশে তিনি 'এখন একধরণের ফ্যাসান হয়ে উঠেছেন ঃ কিশোরীরা কিশোররা তরুণেরা নির্বাধ অধ্যাপকেরা দুশ্চরিত্র আমলারা এমনকি মাংসল চিত্রতারকারাও তার নাম উচ্চারণে উচ্ছ্বসিত হন'। এই কথা বলেছেন আগে উল্লেখিত সেই কবি হুমায়ুন আজাদই। কবির এমন পপুলারিটি একটা দারুণ ব্যাপার হলেও হুমায়ুনআজাদ এটাকে মানতে পারেন নি। সম্ভবত তাঁর সন্দেহ রয়েছে ভাল কবিতা লিখলে কবির জীবিতকালে এতটা সর্বজনপ্রিয়তা সম্ভবই নয়। এই সন্দেহের সূত্র ধরে শামসুর রাহমানের কবিতা যদি ফিরে পড়ি তাহলে হয়তো চোখে পড়তে পারে তাঁর কবিতায় অতিকথনের কোথাও প্রশ্রয় রয়েছে বা কিছুটা মন্থরতারও। কিছুটা ক্লান্তিরও কারণ হয়েছে কোনোটা। শব্দ নির্বাচনে তিনি বড় বেশি গণতান্ত্রিক। এই বিষয়ে বিতর্ক উঠতেই পারে। কেউ বলতে পারেন কবিতার নির্মিতি ও শব্দচয়নের মধ্যেই সময়কে অতিক্রম করে যাওয়ার চাকা দুটি থাকে। অন্যেরা একথা খন্ডন করে বলতে পারেন ভাষা এক বিশেষ চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠে এবং সে ভাষায় যারা কথা বলে তাদের অভিলাষ সততই স্বতন্ত্র। সেই সস্বতন্ত্রকে যে ভাষায় যে নির্মিতিতে কবিতায় ধরা সম্ভব সেটা স্বরাট, তার জন্যে কোনো নির্দেশ দরকার পড়ে না। সেটা কবিতে 'আপনিই ফোটে'।

বিতর্ক করুন পণ্ডিতজনেরা, আমরা তাঁকে বাংলাদেশের প্রধান দু-জন কবির একজন মনে করি। অন্যজন আল মাহমুদ। বাংলাদেশ সম্ভব হয়েছিল যাঁদের প্রাণের বাজিতে, যে কবিদের সেখানে শামসুর রাহমান কিন্তু একমাত্র প্রধান। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হযেছিল অনেকবার। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় যখন সেখানকার বহু কবি কলকাতায় এসে থেকে ছিলেন তখন দেশের বাইরে যাবার হাজার সুযোগ ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি থেকে গিয়েছিলেন ঢাকায়। শত্রুকে চোখের সামনে রেখে। তিনি দেখেছেন লক্ষ লক্ষ বাঙালির জীবনের বিনিময়ে আত্মপ্রকাশ করেছে রক্তস্নাত একটি দেশ, বাংলাদেশ। এই দেশ সহজ ছিল না কিম্বা স্বপ্নও নয়। আমরা কি কল্পনা করতে পারব কবি সামসুর রাহমানের সেদিনের ক্ষত বিক্ষত চিত্তটিকে? তাঁর ব্যক্তিগত জীবন হয়ে গিয়েছিল অনিশ্চিত, পায়ে পায়ে মৃত্যু। অথচ একেকটি রাত কেটেও যাচ্ছিল, কিন্তু কোনো ভোরই ছিল না নিঃশঙ্ক, হত্যাকারি - মুক্ত। আমাদের মনে পড়বে ফ্রান্ৎস কাফকার একটি উপন্যাস 'দ্যা ট্রায়াল', যেখানে নায়ক প্রতিটি মিনিট অপেক্ষা করছে এক ভয়ানক শাস্তিবিধানের দিকে তাকিয়ে, সেটা প্রাণদন্ডও হতে পারে। কবি শামসুর রাহমানের অবস্থাও তার চাইতে ব্যতিক্রম ছিল না। যাঁর জীবন এই, তিনি কি একটু বেশি বলবেন? তাঁর অভিজ্ঞতা যন্ত্রণায় মোড়া। তাকে কবিতায় বয়ন শব্দ নির্বাচনের অপেক্ষায় কি ব্যর্থ হতে পারে? যে জীবন আমরা জানি না, যে আবেগ আমাদের ধারণার বাইরে, যে জায়গা থেকে যে কবিতা তার বিচার নিয়ে বসতে পারেন পেশাদার কেউ। আমাদের মনে হয়েছে সামসুর রাহমান কোনো বিচ্ছিন্ন কবিতা লেখেন নি তাঁর সব কবিতা নিয়ে আসলে একটি জাতীয় গাথা। সেই গাথা বাংলাদেশের নিসর্গের মতো অফুরন্ত ও বিচিত্র।